বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা
খণ্ড ৩৫ বার্ষিক সংখ্যা ১৪২৪

পোশাক শিল্পের বৈশ্বিক শৃঙ্খলঃ সাভার থেকে নিউইয়র্ক

আনু মুহাম্মদ*

১। ভূমিকা

বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্প বৃহত্তর বৈশ্বিক বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান, বাজার ও মুনাফার জাল বা শৃঙ্খলের (গ্লোবাল চেইন) একটি অংশ। প্রায় ২৮ বিলিয়ন ডলারের এই শিল্প, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান পশ্চিমা পোশাক ব্র্যাণ্ড মার্কস অ্যান্ড স্পেন্সার, টেসকো, গ্যাপ এবং ওয়ালমার্ট-এ পণ্য সরবরাহ করে এবং সেই সাথে সারা বিশ্বে গার্মেন্টস শ্রমিকদের মধ্যে সর্বনিম্ন মজুরি প্রদান করে।

বাংলাদেশের শ্রমিকরা যখন সাভার, আশুলিয়া, মিরপুর, গাজীপুরসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের কারখানাগুলোতে দিনে ও রাতে কাজ করে চলেন, তখন তাদের অতিরিক্ত কর্মঘণ্টা পকেট ভারী করতে থাকে হাজার হাজার মাইল দূরে অবস্থিত নিউইয়র্ক, লন্ডনসহ বিশ্বের বড় বড় শহরের কর্তাব্যক্তিগণ। বিভিন্ন হিসাব থেকে দেখা যায় যে, পশ্চিমা বাজারে কমপক্ষে ১০০ ডলারে বিক্রি হয় এমন প্রত্যেকটি পোশাক থেকে সেই দেশের সরকার গড়ে প্রায় ২৫ ডলার, ব্র্যান্ড ও বায়িং হাউজগুলো কমপক্ষে ৫০ ডলার এবং বাকি অংশ কাঁচামালসহ উৎপাদন খরচ ও মুনাফা হিসেবে আসে। শ্রমিকদের পকেটে যায় এর এক ডলারেরও কম অংশ।

ওয়ালমার্টের মতো একচেটিয়া ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের মুনাফা বৃদ্ধির লক্ষ্য পূরণের জন্য পোশাকের দাম কমিয়ে রাখে, যা প্রকারান্তরে পোশাক সরবরাহকারী দেশগুলোর শ্রমিকদের জীবনকে আরও ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলে। কমদামে কাপড় বিক্রির পর তা থেকে সর্বাধিক মুনাফা বজায় রাখার জন্য স্থানীয় মালিকরা শ্রমিকদের মজুরি ও নিরাপত্তায় খরচ কমায়। এর ফলে বৈশ্বিক উচ্চ নিষ্ঠুর মুনাফার একটি নিষ্ঠুর চক্র/শৃঙ্খল তৈরি হয়। স্থানীয় ও বৈশ্বিক মুনাফাখোররা লাখ লাখ শ্রমিককেও বঞ্চিত করে জীবনঝুঁকির মধ্যে ঠেলে দিয়ে লভ্যাংশের বিভিন্ন অংশ নিজেদের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য অনুযায়ী ভাগ করে নেয়।

এই নিরাপত্তাহীনতা ও বঞ্চনা ব্যবস্থার ফলে শ্রমিকদের জীবনে যে ঝুঁকি ও দুর্বলতা তৈরি হয় তারই প্রকাশ দেখা গেছে স্পেকট্রাম, স্মার্ট, তাজরিন ও রানা প্লাজায় সংঘটিত দুর্ঘটনাগুলোতে। নিরবচ্ছিন্ন মৃত্যুর এবং জীবনব্যাপী কষ্টের একেকটি জ্বলন্ত ক্ষেত্র তৈরি করেছে এই কারখানাগুলো। সীমাহীন লোভ আর সেই সাথে অমানবিক ব্যবস্থা পোশাক কারখানাগুলোতে মৃত্যুর ফাঁদ ও বঞ্চনার উৎস তৈরি করেছে।

এই প্রবন্ধে পোশাক শিল্পের উত্থান এবং বিশ্বব্যাপী এর সংযোগজালের মধ্যে ওয়ালমার্টের মতো একচেটিয়া মুনাফাকারীদের সাথে শ্রমিকদের জীবনের সম্পর্ক অনুসন্ধান করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। সেই সাথে এই অমানবিক ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতে স্থানীয় ও বৈশ্বিক গোষ্ঠীর ভূমিকা পর্যালোচনা করা

* অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

হয়েছে। অধিকন্তু রানা প্লাজার মতো সবচেয়ে নৃশংস অধ্যায়ের পর শিল্পবিকাশ ধারা ও শ্রমিকদের জীবনে এর ফলাফল কিরূপ তাও আলোচনা করার প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে।

২। এই শিল্পের শুরু

চীনের পর পরই বাংলাদেশ এখন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম পোশাক রপ্তানিকারক দেশ। বৃহৎ পোশাক শিল্প রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে বাংলাদেশের এই উত্থানের পেছনে অভ্যন্তরীণ ও বহিস্থ: উভয় কারণই কাজ করেছে, যা এই শিল্পের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল।

এই শিল্পের উত্থান এমন একটি সময়ে ঘটে যখন স্থানীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো একদিকে যেমন কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচির আক্রমণের মুখোমুখি হয়েছিল, তেমনি বৈশ্বিক পুঁজি এমন নতুন এলাকা খুঁজছিল যেখানে বিপুল পরিমাণে সস্তা শ্রম বিদ্যমান, এবং যে শিল্প বিশ্ববাজারের জন্য পণ্য যোগান দেবে। এই সস্তা শ্রম সরবরাহে বাংলাদেশ ছিল উপযুক্ত ক্ষেত্র।

১৯৭৪ সালে যখন পশ্চিমা বিশ্ব মাল্টি-ফাইবার চুক্তি (এমএফএ) অনুযায়ী প্রান্তস্থ দেশগুলো থেকে পণ্য আমদানি শুরু করে তখনও পর্যন্ত বাংলাদেশে কোনোও রপ্তানিযোগ্য পোশাক শিল্পের অস্তিত্ব ছিল না। এই চুক্তি ব্যবস্থার ফলে দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ানসহ অনেক গার্মেন্টস রপ্তানিকারক দেশে দ্রুত এই শিল্পে বিকাশ লাভ করে। এক পর্যায়ে তাদের উপর ধার্যকৃত কোটার কারণে দক্ষিণ কোরিয়ার মতো দেশের উদ্যোক্তারা নতুন উৎপাদন ক্ষেত্র হতে পারে এমন দেশ খুঁজছিল, ১৯৭৭ সাল নাগাদ তারা যৌথ উদ্যোগ এবং কোটামুক্ত দেশের সুবিধা গ্রহণের জন্য বাংলাদেশকে বাছাই করে। সেখান থেকেই বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের যাত্রা শুরু। খুব দ্রুতই পোশাক শিল্পের বিস্তৃতি দেশের বিদ্যমান শিল্পের ভূচিত্র বদলে দেয়, এমনকি ২০০৪ সালে এমএফএ চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও বাংলাদেশের পোশাক শিল্প কম খরচে উৎপাদনের মাধ্যমে ক্রমাগত বিস্তৃত হতে থাকে।

এর পাশাপাশি ১৯৮০-এর দশকের শুরু থেকে অন্যান্য অনেক দেশের মতোই "স্যাপ" বা কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচির কারণে বাংলাদেশের অনেক বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান বন্ধ হওয়া শুরু হয়। এই অ-শিল্পায়ন (deindustrialization) এর কারণে লাখ লাখ শ্রমিক যেমন একদিকে বেকার হয়ে যাচ্ছিল, তেমনি অন্যদিকে সুবিধাজনক বৈশ্বিক ও স্থানীয় নীতি এবং প্রণোদনার কারণে রপ্তানিমুখী শিল্পের দ্রুত বিস্তার ঘটে। যা উদ্বৃত্ত শ্রমশক্তি, বিশেষ করে তরুণ নারীদের জন্য নিম্ন মজুরি, ট্রেড ইউনিয়ন বিহীন ও কম নিরাপত্তার কাজের বাজার তৈরি করে (বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বিশ্বায়ন ও তার গতিমুখ পর্যালোচনার জন্য দেখুন Muhammad 2007)।

তাই বাংলাদেশের রপ্তানি ভিত্তিক পোশাক শিল্পের বিবর্তনের সাথে স্থানীয় ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব এবং নতুন আন্তর্জাতিক শ্রম বিভাজনের পুনর্গঠন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সেই সাথে সরকার ও আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে নীতি ও ঋণ সহায়তা এবং নিম্ন মজুরিতে অনুকূল পরিবেশ এই শিল্পের বিকাশে সহায়তা করেছে।

তৈরি পোশাক শিল্পের রপ্তানি আয় ১৯৮১ সালের ৩.৫ মিলিয়ন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭ সালে প্রায় ২৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। এই শিল্পভিত্তি দৃঢ় করবার মতো যথেষ্ট সহায়ক শিল্প (linkage industry) গড়ে উঠেনি বলে এই শিল্পের প্রয়োজনীয় উপাদান/কাঁচামাল আমদানিতে

খরচ হয় অনেক বেশি। এই শিল্পের সাথে প্রায় ৪০ লাখ কিশোর ও তরুণ বিশেষ করে নারী শ্রমিক জড়িত, যারা প্রায় বিপর্যস্ত পাট, বস্ত্র ও চিনি শিল্প কারখানাগুলোর তুলনায় অনেক কম মজুরি ও কম নিরাপত্তার ব্যবস্থায় কাজ করেন।

নব্বই দশক থেকে এই শিল্পে বহুবার অগ্নিকাণ্ড ও কারখানা ধসে পড়ার ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু অনিরাপদ কর্মপরিবেশ অব্যাহত থাকায় ২০১২ সালে তাজরীন অগ্নিকাণ্ড এবং ২০১৩ সালে রানা প্লাজা ধসের মতো ভয়াবহ হতাহতের ঘটনা এই বর্ধিষ্ণু খাতে শ্রমিকদের ন্যূনতম নিরাপত্তা এবং তাদের অধিকারের নাজুক অবস্থা বিশ্বব্যাপী মনোযোগ আকর্ষণ করে। সেই সাথে বড় বড় পোশাক ব্র্যান্ড, বায়িং হাউজ, সরকার ও স্থানীয় মালিক পক্ষের দায়িত্ব ও ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তৈরি করে।

৩। শিল্পখাত সংস্কার: রপ্তানি কর না হয় মর

বিশ্ব পুঁজি ব্যবস্থা তার ক্রমবর্ধমান বিকাশের মাধ্যমে পণ্যের উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার বিশ্বায়ন ঘটিয়েছে। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে তৈরি পোশাক শিল্পও বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত একটি শিল্প হিসেবে বিকশিত হচ্ছে। আজকের বিশ্বায়ন বিশ্বজুড়ে প্রচলিত শ্রমবিভাজনের ধারণাকে পুনঃসংজ্ঞায়িত করেছে, ক্রমাগত উত্তর থেকে দক্ষিণে কারখানাগুলোকে স্থানান্তরিত করেছে, উত্তরে তৈরি করেছে কাঠামোগত বেকারত্ব এবং পার্শ্ববর্তী দেশগুলোকে সস্তা শ্রমের উৎস হিসেবে ব্যবহার করছে।

এটা বিশেষভাবে খেয়াল করবার বিষয় যে, বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ নির্দেশিত এবং বাংলাদেশ সরকারের বাস্তবায়িত নয়া-উদারনীতি এবং প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের পদক্ষেপগুলো নিছক অর্থনৈতিক বিষয় নয়, এর পেছনে একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক মতাদর্শও কাজ করেছে। এই সংস্কারগুলো কেবল পুরনো বৃহৎ শিল্পগুলোকে বিনষ্ট করার জন্য নয় বরং সেই সাথে বেসরকারি মূলধনের প্রসারের পাশাপাশি শ্রমিকদের সংঘ-শক্তিকে ধ্বংস করাও লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করেছিল।

এই নব্য-উদার নীতির প্রভাবের কারণে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোর বেসরকারিকরণ, শিল্প ইউনিটগুলো হ্রাস, এবং তথাকথিত "ক্ষতিগ্রস্ত" কোম্পানিগুলো বন্ধ করা ও সেই সাথে শ্রমিক ছাঁটাই পরম্পরাগতভাবে সরকারের উচ্চ অগ্রাধিকারে পরিণত হয় (এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, Muhammad 2006)।

রাষ্ট্রায়ত্ত-শিল্প কারখানাগুলোর সংকোচন এবং শিল্পায়নের বিপরীতে চলার কারণে আশির দশকে ব্যাপক বেকারত্বের সৃষ্টি হয়। এই প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত রূপ বাস্তবায়িত হয় ২০০২ সালে বিশ্বের বৃহত্তম পাটকল আদমজী জুট মিল বন্ধের মাধ্যমে, যা "পাট শিল্পের উন্নয়ন" সংস্কারের নামে বিশ্বব্যাংকের কাছ থেকে ২৫ কোটি মার্কিন ডলারের ঋণ নিয়ে সম্পন্ন করা হয় (বাংলাদেশে পাটখাত সংস্কার এবং পাটশিল্পে ধস নিয়ে আলোচনার জন্য দেখুন, Muhammad 2002)। একের পর এক বৃহৎ শিল্পকারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বহু পরিবার বেকারত্বসহ আর্থিক অনটনের মধ্যে প্রবেশ করে। দরিদ্র ও কর্মসংস্থানহীন পরিবার থেকে আসা তরুণ নারী শ্রমিকদের এক বিশাল অংশ নিম্নতম মজুরি এবং অতিরিক্ত সময় কাজ করার জন্য প্রস্তুত নতুন এই শ্রমবাজার সৃষ্টি করে। আর নব্য ধনী যারা উচ্চ লাভজনক বিনিয়োগ করার পন্থা খুঁজছিল তারাই এই নতুন শ্রমবাজারের ক্রেতা-মালিক হয়ে ওঠে।

১৯৮০-এর দশকের শুরু থেকেই পরবর্তী সকল সরকার কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচি নীতি বজায় রেখে রপ্তানিমুখী শিল্প ও বৈদেশিক বিনিয়োগের জন্য নানা সুযোগ-সুবিধাসহ দীর্ঘ প্রণোদনা তালিকা বজায় রেখেছে। বাংলাদেশে রপ্তানিমুখী শিল্পের জন্য উল্লেখযোগ্য প্রণোদনাগুলো হলো মূলধনী যন্ত্রপাতির উপর শতভাগ আমদানি শুল্ক মওকুফ, ইপিজেড বা রপ্তানি অঞ্চল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রপ্তানিকারকদের নানা ভর্তুকি প্রদান, পণ্য উন্নয়ন ও প্রচারের জন্য রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল (ইপিএফ) গঠন, রপ্তানি থেকে প্রাপ্ত আয়ের উপর আয়কর মওকুফ, রপ্তানি পণ্যের জন্য বিশেষভাবে কাঁচামাল আমদানি করে তাদের জন্য আমদানি লাইসেন্স ফির উপর ছাড়, সাধারণ ব্যবসার জন্য আয়ের উপর ছাড়, ব্যাংক ঋণ সুবিধা, ট্রেড ইউনিয়ন ছাড় ইত্যাদি।

রপ্তানিমুখী শিল্পকে বিভিন্নমুখী প্রণোদনা ও ভর্তুকি দেবার নীতির পিছনে যুক্তি ছিল রপ্তানিই একমাত্র পথ, না হলে ধ্বংস হয়ে যেতে হবে। অর্থশাস্ত্রের পাঠ্যপুস্তকও বলতে থাকে, যদি দরিদ্র দেশগুলো তাদের রপ্তানি করার উৎস বাড়াতে না পারে অথবা রপ্তানিমুখী পথে দ্রুত পা না চালায় তবে তারা ক্রমশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

প্রান্তস্থ দেশের জন্য রপ্তানিমুখী শিল্পই একমাত্র পথ এই তত্ত্ব ১৯৫০ সাল থেকেই "কর্পোরেট অর্থশাস্ত্র" জোরেশোরে প্রচার করেছে। তবে এই মডেল একেবারে বিনা প্রশ্নে পার হয়নি। এই মডেলের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ সমালোচনা উপস্থিত করেন প্রায় একই সময়ের দুইজন অর্থনীতিবিদ রাউল প্রেবিশ এবং হ্যান্স সিঙ্গার। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং উত্তর-দক্ষিণের দেশগুলোর বাণিজ্য শর্ত সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্তের উপর ভিত্তি করে এ দুই অর্থনীতিবিদের প্রায় একইরূপ তাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত "প্রেবিশ-সিঙ্গার থিসিস" নামে বিখ্যাত। এতে দেখানো হয় যে, প্রান্তস্থ রপ্তানিকারক দেশসমূহ একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর প্রাথমিক পণ্যের রপ্তানির তুলনায় আরও বেশি দামে কেন্দ্র দেশগুলো থেকে শিল্প পণ্যের আমদানি করবে। তারা আরও দাবি করেন যে, নিম্ন আয় এবং চাহিদা-মূল্যের স্থিতিস্থাপকতার (price-elasticities of demand) কারণে প্রাথমিক-পণ্য রপ্তানিকারকদের বাণিজ্য শর্ত ক্রমশ প্রতিকূলে যেতে থাকবে (Todaro and Smith 2006)।

পরে পূর্ব-এশীয় এবং অন্যান্য কিছু দেশ শিল্পজাত পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে নতুন প্রত্যাশা সৃষ্টি করে। কিন্তু এই কাঠামোগত পরিবর্তন উন্নয়নশীল দেশগুলোতে যেরকম প্রত্যাশিত সুবিধা নিয়ে আসার কথা ছিল সেটা অর্জন করতে পারেনি, উৎপাদনকারীদের মধ্যে দামের আপেক্ষিক পরিবর্তন ভিন্ন দিকে চলে গেছে। গত শতাব্দীর শেষ চতুর্ভাগ ধরেই দরিদ্র দেশের দ্বারা রপ্তানি করা মৌলিক উৎপাদিত পণ্য বা শিল্পজাত পণ্যের দাম ধনী দেশগুলো দ্বারা উৎপাদিত পণ্যের তুলনায় কমে যায়। বিশেষ করে বস্ত্রশিল্পজাত পণ্যের দামের দ্রুত হ্রাসের সাথে সাথে স্বল্প-দক্ষ ইলেকট্রনিক যন্ত্রের দামেরও পতন ঘটে (Todaro and Smith 2006:524)।

জাতিসংঘের এক গবেষণায় দেখা গেছে যে, ২০০০ বা একবিংশ শতকে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় (বেশিরভাগ রপ্তানি পণ্য শিল্পজাত) বাণিজ্য শর্তাবলী বাণিজ্যকে ক্রমশ দুর্বলতর করেছে (UN 2008)। অতএব প্রাথমিক পণ্য উৎপাদন থেকে রূপান্তর ঘটিয়ে তৈরি পোশাক শিল্পের মতো পণ্য উৎপাদন বাংলাদেশের মতো দেশগুলোর ঝুঁকি পরিবর্তন করে না। বস্তুত কালের বিবর্তনে দেখা গেছে যে, বিভিন্ন দেশের বাণিজ্যে আপেক্ষিক অবস্থান পণ্যের ধরনের ওপর নয় বরং বিশ্ব ক্ষমতা কাঠামোয় তার অবস্থানের ওপর নির্ভর করে।

সুতরাং 'রপ্তানি অথবা ধ্বংস' মডেলটি প্রান্তস্থ অর্থনীতির দেশগুলোর জন্য দুই ধার বিশিষ্ট তলোয়ার হিসেবে কাজ করছে। যেখানে একদিকে এই দেশগুলোর কাছে উত্তরের নির্দেশিত রপ্তানি ভিত্তিক প্রবৃদ্ধির দিকে চলা ছাড়া কোনো বিকল্পপথ নেই, তেমনি অন্যদিকে এই পথে চলায় দেশগুলো বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকির সম্মুখীন হতেই থাকছে।

প্রথমত, বাণিজ্য শর্তগুলো সব সময় প্রান্তস্থ দেশগুলোর বিপক্ষে কাজ করে। উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশ থেকে রপ্তানিকৃত তৈরি পোশাকের মূল্য কেন্দ্রীয় অর্থনীতি থেকে আমদানি করা পণ্যের তুলনায় সব সময়ই আপেক্ষিকভাবে পিছিয়ে রয়েছে। অন্যকথায়, আমাদের দেশকে একই পরিমাণ পণ্য আমদানির জন্য বেশি পরিমাণ পণ্য রপ্তানি করতে হচ্ছে। সেই সাথে দেশের রপ্তানি আয় বৃদ্ধির জন্য রপ্তানি মূল্য যতটা সম্ভব কম রাখা যায় সেই চেষ্টা এবং মুদ্রার অবমূল্যায়ন ধরে রাখার জন্য কৃত্রিম নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করতে হচ্ছে, যা অনিবার্যভাবে অর্থনীতির অন্যান্য ক্ষেত্রগুলোর উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

দ্বিতীয়ত, প্রান্তস্থ রপ্তানি-ভিত্তিক অর্থনীতির দেশগুলোর রপ্তানি পণ্যের বাজার কেন্দ্রীয় অর্থনীতির অবস্থার ওপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশের মতো দেশগুলো ঐসব দেশের অর্থনৈতিক সংকট, বেকারত্ব, ট্যারিফ ও নন ট্যারিফ সম্পর্কিত বিভিন্ন বাধা (মাসুল ও অমাসুল সম্পর্কিত বাধা), রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ইত্যাদির মাধ্যমে হুমকিতে থাকে। এর উপর আমদানিকারক দেশসমূহ বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র অন্যান্য বিষয়ে সুবিধা নেওয়ার জন্য দরকষাকষির হাতিয়ার হিসেবে বাংলাদেশের রপ্তানি-নির্ভরতা ব্যবহার করে।

তৃতীয়ত, বিভিন্ন তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, বিশ্ব বাজারে তৈরি পোশাকের বিক্রয় মূল্যের ৬০ থেকে ৮০ শতাংশ যায় আন্তর্জাতিক বিক্রেতা ও খুচরা বিক্রেতাদের কাছে। বিক্রেতাদের লক্ষ্য হলো দুটি :

১) দাম যত সম্ভব কম রাখা, এবং

২) সর্বোচ্চ সম্ভাব্য হারে মুনাফা বাড়ানো।

এ দুটো লক্ষ্য পূরণের জন্য স্থানীয় মালিকরা খরচ কমানোর কৌশল গ্রহণ করেন, যা সমগ্র শিল্পকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলে ও শ্রমিকদের অবিরাম চাপের মধ্যে রাখে এবং এই কারণেই কারখানাগুলো প্রায়শই আবির্ভূত হয় কবরের স্তূপ হিসেবে।

৪। কারখানাগুলোতে মৃত্যু ফাঁদ : দায় ও দায়িত্ব

১৯৯০ এর দশকের শুরু থেকে বিভিন্ন গার্মেন্টস কারখানায় কর্মরত দুই হাজারের বেশি শ্রমিক প্রাণ হারিয়েছে, যাদের অধিকাংশই কিশোরী। আগুন কিংবা অননুমোদিত বা ত্রুটিযুক্ত কারখানা ভবন ধ্বংসের ফলেই এই শ্রমিকদের মৃত্যু ঘটেছে। এছাড়াও গুন্ডা অথবা পুলিশের বন্দুকের গুলিতে, গুপ্ত হত্যা এবং কর্মস্থলে যাতায়াতের পথে ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছে হাজারেরও বেশি নারী শ্রমিক।

কারখানা ভবনের মারাত্মক 'দুর্ঘটনাগুলোর' পিছনের কারণগুলি নির্দিষ্ট করতে আগুন লাগা এবং ধসে পড়া ভবনের কিছু তথ্য উল্লেখ করা প্রয়োজন। যেমন : ১৯৯০ সালে ঢাকার সারাকা গার্মেন্টসে ৩২ জন, ১৯৯৬ সালে ঢাকার লুসাকা গার্মেন্টসে ৩২ জন, ১৯৯৭ সালের নারায়ণগঞ্জের জাহানারা ফ্যাশনে ২০ জন, ঢাকার সাংহাই অ্যাপারেলসে ১৯৯৭ সালে ২৪ জন, ম্যাক্রো কারখানায় ২০০০ সালে ২৩ জন, ২০০৪ সালে নরসিংদীর চৌধুরী নিটওয়্যারে ২৩ জন এবং ২০০৫ সালের ৬ জানুয়ারি নারায়নগঞ্জের শান নিটিং এণ্ড প্রসেসিং লিমিটেডে অগ্নি দুর্ঘটনায় ২৩ জন শ্রমিক নিহত হয়। এসব হতাহতের প্রধান কারণ আগুন লাগার সময় এই ভবনগুলোর সবগুলো গেইট বন্ধ ছিল।

রানা প্লাজা দুর্ঘটনারও ৮ বছর আগে সাভারে ২০০৫ সালের ১১ এপ্রিল নয়তলা বিশিষ্ট আরেকটা গার্মেন্টস কারখানায় (স্পেকট্রাম) ভবন ধসে পড়ার ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় প্রায় ১০০ জন শ্রমিক মারা যায় এবং আরও ১০০ জন শ্রমিক অদ্যাবধি নিখোঁজ রয়েছে। এই কারখানাটির উৎপাদিত পণ্য ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের বাজারের জন্য তৈরি হতো এবং যথাযথ অনুমোদন ছাড়াই ভবনটি নির্মাণ করা হয়। আরেকটি ভবনে অগ্নি দুর্ঘটনায় ২০০৬ সালের মার্চ মাসে সায়েম ফ্যাশনসহ অন্যান্য গার্মেন্টসে কর্মরত ৩ জন শ্রমিক নিহত এবং প্রায় ৫০ জন শ্রমিক আহত হয়। ২০০৬ সালের প্রথম দিকে আরও তিনটি কারখানায় দুর্ঘটনা ঘটে এর মধ্যে ঢাকায় দুটি ও চট্টগ্রামে সংঘটিত একটি দুর্ঘটনায় কমপক্ষে ১৪২ জন শ্রমিক মারা যায় ও ৫০০ জনেরও বেশি আহত হয়, যাদের অনেকেই সারা জীবনের জন্য অক্ষম হয়ে পড়ে। আর চট্টগ্রামের কে টি এস গার্মেন্টস এ দুর্ঘটনায় ২০০৬ সালে প্রাণ হারায় আরও ৬২ জন শ্রমিক। তবে স্পষ্টতই এই তালিকা ছিল অসম্পূর্ণ এবং মৃতের তালিকা অনেক ছোট করে দেখানোর চেষ্টাও দেখা গেছে। আমরা এখনও অনেক দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারিনি (Muhammad 2011)।

বিভিন্ন সংবাদপত্র প্রতিবেদন এবং গবেষণায় দেখা গেছে যে, কারখানাগুলোতে যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনার অভাবেই এই দুর্ঘটনাগুলো ঘটেছে। এই সময়ে সরকারি তদারকির দুর্বলতা প্রকাশিত হয় পরিদর্শক সংখ্যায়। পরিসংখ্যান অনুযায়ী মাত্র তিনজন পরিদর্শক ঢাকা বিভাগের "কারখানা পরিদর্শন কার্যালয়ের" অধীনে ১৫,০০০ কারখানার নিরাপত্তা পরিদর্শন করতে নিযুক্ত ছিলেন। এবং সারা দেশে নিবন্ধিত প্রায় ৫০,০০০ কারখানার জন্য মাত্র ২০ জন পরিদর্শক নিয়োজিত ছিলেন। এদের মধ্যে চার জন প্রধান কার্যালয়ে, ছয়জন ঢাকার বিভাগীয় কার্যালয়ে এবং বাকি ৩ জন চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহীর বিভাগীয় কার্যালয়ে বসতেন (The Daily Star, February 28, 2006)।

এর চার বছর পর ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তাদের উদ্ধৃতি দিয়ে আরও একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, বেশিরভাগ গার্মেন্টস কারখানায় জরুরি বাতি জ্বলার ব্যবস্থা নেই যা দুর্ঘটনার সময় বিদ্যুৎ সংযোগ ছাড়া চালু করা যায়। এই কারণে অগ্নি দুর্ঘটনার সময়ে পুরো কারখানাটি অন্ধকারে ঢাকা পড়ে থাকে (The Daily Star, Feb 27, 2010)।

২০১০ সালের ১২ ডিসেম্বর চট্টগ্রামে দক্ষিণ কোরিয়ান গ্রুপের মালিকানাধীন একটি কারখানার শ্রমিকদের উপর পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালিয়ে অন্তত ৩ জন শ্রমিককে হত্যা করে। এই শ্রমিকরা "পূর্বনির্ধারিত বেতনে" মালিদের বেতন না দেওয়ার প্রতিবাদে বিক্ষোভ করছিল এবং এই বিক্ষোভে কয়েক হাজার শ্রমিক কয়েক দিন ধরে অংশ নিচ্ছিল, যাদের ওপর এই গুলি চালানোর ঘটনা ঘটে।

পুলিশ দ্বারা সংঘটিত এই হত্যাকাণ্ডের ঠিক দুই দিন পরে ঢাকার আশুলিয়ায় হা-মীম পোশাক কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় অন্তত ২৬ থেকে ৩১ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয় এবং জখম হয় ১০০ জনেরও বেশি শ্রমিক। এই দুটি ঘটনায় মৃত শ্রমিকদের সঠিক সংখ্যা এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি। ২৩ নভেম্বর ২০১২ সালে তাজরিন ফ্যাশন লিমিটেডের মালিকানাধীন একটি কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে কারখানাসহ শতাধিক শ্রমিক সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়।

এই কারখানায় ওয়ালমার্ট, সিয়েরা, ওয়াল্ট ডিজনীসহ বিশ্বব্যাপী পরিচিত আরও বিভিন্ন ব্র্যাণ্ডের পণ্য উৎপাদিত হতো, কিন্তু এর মালিকের বিরুদ্ধে ২০১৩ সালের শেষ নাগাদও কোনোও ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। তবে বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন ও একদল সক্রিয় (activist) নৃ-বিজ্ঞানী গোষ্ঠীর আইনি ব্যবস্থার ফলে ২০১৩ সালে তাজরীনের মালিককে আদালতে আনা হয় এবং আদালতের আদেশে অগ্নিকাণ্ডের প্রায় ১৩ মাস পর মালিককে গ্রেপ্তার করা হয়। তাজরীন অগ্নিকাণ্ডসহ এই সব মারাত্মক দুর্ঘটনা বাংলাদেশ পোশাক উৎপাদন ও রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান (বিজিএমইএ)" এবং সরকারের মধ্যে কোনোও সচেতনতা সৃষ্টি করতে পারেনি কারণ এসব দুর্ঘটনার পর যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের নিষ্ক্রিয়তা ও দায়িত্বহীনতাই এই শিল্পে বিদ্যমান সমস্যাগুলোকে জিইয়ে রেখেছে। এই কারণেই তাজরীন অগ্নিকাণ্ডের মাত্র পাঁচ মাসের মধ্যে ২৪ এপ্রিল ২০১৩ বাংলাদেশের এবং বিশ্বের সবচেয়ে মারাত্মক শিল্প দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়, যাতে প্রায় ১,১৩৫ জন শ্রমিক নিহত, শতাধিক নিখোঁজ এবং আরও অনেকে আহত হয়। সাভারের রানা প্লাজা কার্যত গার্মেন্টস শ্রমিকদের একটি গণকবরে রূপান্তরিত হয়। শুধুমাত্র পাঁচ তলা ভবনের অনুমতি সত্ত্বেও আট তলা দালান নির্মাণ করা হয়। শুধু তাই নয়, একজন প্রকৌশলী রানাপ্লাজা ধসের আগের দিন ভবনের গায়ে ফাটল লক্ষ করেন এবং ভবনের নিরাপত্তার ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করা সত্ত্বেও কারখানাগুলো খোলা রাখা হয়। কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের হয় কাজে যোগদান নয় শাস্তির সম্মুখীন হওয়ার ভয় দেখিয়েছিল।

হঠাৎ করে বিদ্যুৎ চলে যাওয়ার পর যখন জেনারেটরগুলি পুনরায় চালু করা হয় তখনই দালানটি হাজার হাজার শ্রমিকসহ ধসে পড়ে। এই দালানে পাঁচটি গার্মেন্টস কারখানা চালু ছিল- নিউ ওয়েভ স্টাইল লিমিটেড, নিউ ওয়েভ বটম লিমিটেড, ফ্যান্টম অ্যাপারেলস লিমিটেড, ফ্যান্টম টেক লিমিটেড এবং ইথার টেন্স লিমিটেড। ভবন ধসের পর ২,৪৩৮ জন শ্রমিককে উদ্ধার করা হয় এবং নিহত হিসেবে শনাক্ত হয় ১,১৩৫ জন। বেশ কয়েকটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, এই শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকরা বিশ্বে সর্বনিম্ন মজুরিতে ও সম্পূর্ণ নিরাপত্তাহীন পরিবেশে কাজ করে অথচ এই শিল্পের মালিক, ক্রেতা ও বিশ্বব্যাপী খুচরা বিক্রেতারা সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন করে।

বিশ্বমানের পোশাক প্রস্তুতকারী এই কারখানাগুলোর কর্মপরিবেশ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অমানবিক। প্রায় সকল শ্রমিক নিম্ন মজুরি, মৌখিক ও শারীরিক নির্যাতন, অনিয়মিত অথবা বকেয়া বেতন, অসংগঠিত কর্মব্যবস্থা ইত্যাদি সমস্যায় জর্জরিত ।

উপরন্তু ১৯৯০ সাল থেকে সংঘটিত এসব দুর্ঘটনার বেশির ভাগেরই সংঘটিত হওয়ার কারণ হচ্ছে দুর্বল বৈদ্যুতিক তারের সংযোগ, অগ্নি নির্বাপন ও অ্যালার্ম ব্যবস্থার অনুপস্থিতি, সংকীর্ণ সিঁড়ি এবং বের

হওয়ার সরু পথ, দুর্বল ভিত্তি, বন্ধ দরজা ইত্যাদি ত্রুটিপূর্ণ কাঠামোগত সমস্যা। এই সমস্যাগুলো এখনও পর্যন্ত বিদ্যমান থাকার মূল কারণ হচ্ছে অপর্যাপ্ত নীতি ও সরকারি সংস্থাসমূহের নজরদারির অভাব, সেই সাথে বিশ্বব্যাপী ব্র্যাণ্ড এবং তাদের এজেন্টগুলোর শ্রমিকদের কর্মপরিবেশের প্রতি অবহেলা ও উদাসীনতা। অতএব উপযুক্ত বিশ্লেষণ করলে আমরা এই মৃত্যুর ফাঁদগুলি তৈরির জন্য দায়ী হিসেবে দেশ-বিদেশের তিনটি গোষ্ঠী চিহ্নিত করতে পারি:

১) কারখানা ও ভবন মালিকরা এবং বিজিএমইএ কর্তৃপক্ষ

রানা প্লাজার ভয়াবহ ঘটনার পূর্ব পর্যন্ত দায়িত্বজ্ঞানহীন মালিকেরা তাদের ভুলের (দোষ) জন্য কোনো রকম আইনি ব্যবস্থার সম্মুখীন হয়নি। বোধ হয়, তাদের ধারণা যা ইচ্ছা তাই করতে পারার মতো স্বাধীনতা তাদের রয়েছে। পোশাক মালিকদের একটি প্রধান সংগঠন হিসেবে বিজিএমইএ-র দায়িত্ব রয়েছে কারখানাগুলোকে তত্ত্বাবধানের পাশাপাশি এই শিল্পের সুন্দর কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য যথাযথ শিল্পনীতি গ্রহণের সুপারিশ করা। কিন্তু এর পরিবর্তে সংস্থাটি দোষী মালিকদের আইনের হাত থেকে রক্ষার শক্তিশালী হাত হিসেবে কাজ করে।

২) সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থাসমূহ

সরকারের অধীন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর ও বিভাগ রয়েছে যাদের দায়িত্ব হলো শিল্প কারখানায় বিদ্যমান অনিয়ম নজরদারি করা এবং যে কোনো ধরনের অনিয়ম, দমন ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া। অথচ এইসব দুর্ঘটনার সময়, আগে ও পরে এসব সংস্থার উপস্থিতি সামান্যই অনুভূত হয়েছে। এমনকি কারখানা পরিদর্শকদের সংখ্যাও এ ব্যাপারে সরকারের উদাসীনতা নির্দেশ করে। বাজেটে কারখানাগুলোর সুরক্ষার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক কারখানা পরিদর্শক নিয়োগের জন্য কোনো বরাদ্দ দেওয়া হয় না।

৩) আন্তর্জাতিক ক্রেতা এবং ব্র্যাণ্ড খুচরা বিক্রেতা

মাঠ পর্যায়ে শ্রমিকদের এই বঞ্চনা, নিরাপত্তাহীনতা এবং সামগ্রিক অনিয়ম এই গোষ্ঠীর কাছে অজানা থাকার কথা নয়। আন্তর্জাতিক ক্রেতা আকৃষ্ট করতে কারখানা মালিকরা প্রায়ই অস্বাভাবিক কম দামে পণ্য সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দেয়। ফলে নির্দিষ্ট হারে লাভ বজায় রাখার জন্য কম খরচে পোশাক সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানগুলো কেমন যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থাগুলো এড়িয়ে যায় বর্তমান শ্রমিকদের কর্মঘণ্টা বাড়ানো এবং অন্যান্য সুবিধা ও শ্রমিকদের কল্যাণ ভাতা হ্রাস করার মাধ্যমে "প্রকৃত মজুরি" কমিয়ে দেয়। মালিকদের খরচ কমানোর এই প্রবণতা শ্রমিকদের বঞ্চনা ও ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। কমদামে পোশাক পেয়ে বেশি আশায় আন্তর্জাতিক ব্র্যাণ্ড ও বায়িং হাউজগুলো এসব বিষয়ে উদাসীন থাকায় একের পর এক মর্মান্তিক ঘটনা ঘটতে পারছে।

৫। গ্লোবাল চেইন বা বিশ্ব সংযোগ: ব্র্যাণ্ড, এজেন্ট ও সাবকন্ট্রাকটর

তৈরি পোশাক শিল্পের বিশ্বব্যাপী উৎপাদন শৃঙ্খল নিম্নে বর্ণিত হলো:

সাব-কন্ট্রাকটর ⟶ ফ্যাক্টরি ⟶ এজেন্ট/বায়িং হাউজ ⟶ ব্র্যাণ্ড খুচরা বিক্রেতা সাভার/ঢাকা/চট্টগ্রাম ⟶ লন্ডন/বার্লিন/স্টকহোম/নিউইয়র্ক/ডিসি/টরেন্টো ⟶ তাজরিন/রানাপ্লাজা ⟶ টপসন ডাউনস/লিফুং ⟶ ওয়াল মার্ট/গ্যাপ।

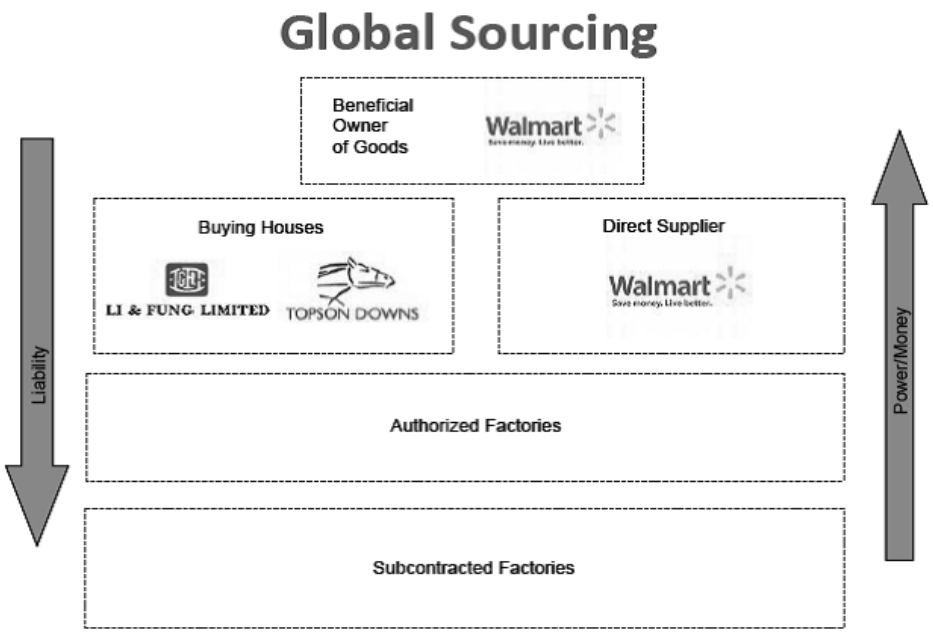

উৎস: Laura Gutierrez, *Save money, live better?* Presentation at JU, Savar, Dhaka, May 14, 2013.

সাম্প্রতিক একটি গবেষণায় দেখা যায় যে, বেশিরভাগ বহুজাতিক সংস্থা তাদের পণ্য উৎপাদনের জন্য "ক্রেতা এবং কারখানাগুলোর" মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনকারী এজেন্টদের উপর খুব বেশি মাত্রায় নির্ভরশীল।

এই এজেন্টরা ক্রেতাদের "একই-দোকানে-সব" এই ধরনের সুবিধা প্রদান করে, যা ক্রেতাদের সরবরাহ সংযোগ (supply chain) সহজ করে দেয়। অবশ্য এই একই প্রক্রিয়া সরবরাহ সংযোগের ওপর ক্রেতাদের নিয়ন্ত্রণ ও স্বচ্ছতা হ্রাস করে।

বিজিএমইএ-র সদস্যদের জন্য প্রণীত নির্দেশিকায় (guide list) প্রায় ১,০০০ জন এজেন্টের নাম উল্লেখ রয়েছে, যারা সারা বাংলাদেশে তালিকাভুক্ত ৪,৪১৭টি কারখানাকে সেবা দিয়ে থাকে। বিজিএমইএ-র সভাপতির মতে প্রায় ৮০ শতাংশ অর্ডার সম্পূর্ণভাবে এজেন্টদের মাধ্যমে পরিচালিত

হয়। যদিও বাংলাদেশের অন্যান্য পরিসংখ্যানের মতোই এই তথ্যটিকে নিরপেক্ষভাবে মূল্যায়ন করা কঠিন (Labowitz and Pawly 2014)।

কারখানা এবং বিশ্বব্যাপী ব্র্যাণ্ডের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনকারী এসব এজেন্ট বা প্রতিনিধি মূলত উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ, হংকং ও ভারত থেকে আগত। যেমন, অনেক ছোট-বড় ভারতীয় কোম্পানি বাংলাদেশের সাথে যৌথ উদ্যোগে বিনিয়োগ করেছে। তৈরি পোশাক শিল্পে তাদের ভূমিকা সম্প্রসারিত হচ্ছে। একজন বিনিয়োগকারীর মতে ভারতের প্রায় ৪০০ বায়িং হাউজ বাংলাদেশে তাদের কাজ পরিচালিত করছে (Narayanan 2013)।

নেতৃস্থানীয় বিশ্বব্যাপী এজেন্ট হিসেবে লি এণ্ড ফুং লিমিটেড এর কথা বলা যায়, যা ১৯৯৬ সাল থেকে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের প্রতিনিধি হিসেবে ওয়ালমার্টসহ অন্যান্য বড় খুচরা বিক্রেতাদের পণ্য সরবরাহ করার সেবায় নিয়োজিত রয়েছে। ২০০৬ সাল থেকেই এই প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ সরবরাহ শৃঙ্খলে (Supply chain) আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১০ সালের জানুয়ারি মাসে "লি এণ্ড ফুং (ট্রেডিং) লিমিটেড" "ডব্লুই এস জি গ্রুপ" নামে একটি নতুন সহায়ক কোম্পানি তৈরি করে, যা বিশ্বব্যাপী ওয়ালমার্টের সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করছে। লি এণ্ড ফুং লিমিটেডের প্রধান এর মতে "সরাসরি সোর্সিং" এর কারণে সর্বনিম্ন মূল্যে বিশাল পরিমাণ এবং কম মার্জিনের ব্যবসার সুযোগ তৈরি হয়েছে, যা ওয়ালমার্টের জন্য একটি বড় সুবিধা (Cheng 2001)। নেতৃস্থানীয় এজেন্ট যেমন 'লি এন্ড ফুং' ক্রেতাদের এমন একটি নিশ্চয়তা দেয় যাতে পণ্যের মান ও শ্রমিকদের সুরক্ষা অন্তর্ভুক্ত (labour compliance audit) থাকে।

এই এজেন্টরা ক্রেতাদেরকে তাদের সরবরাহ-ভিত্তি (supply base) প্রসারিত অথবা চুক্তি বাড়ানোর সুবিধা দিয়ে থাকে। এসব এজেন্ট প্রদত্ত প্যাকেজে যেমন 'স্বচ্ছতা ও নিয়ন্ত্রণ সীমিত করে তেমনি দীর্ঘমেয়াদি প্রতিশ্রুতির অভাব এবং সাব-কন্ট্রাকটিং (sub-contracting) এর উপর ক্রেতাদের নির্ভরশীলতা তৈরির মাধ্যমে পরোক্ষ সোর্সিং এর (sourcing) ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু এর ফলে পণ্যের দাম অনেক কমে যায়, যা ওয়ালমার্টের মতো বিশ্বব্র্যাণ্ডের মূল আকর্ষণ' (Labowitz and Pawly 2014)।

বিজিএমইএ-র মতে, বাংলাদেশের রপ্তানিকৃত পোশাকের ৩০ শতাংশ বিশ্বের বৃহত্তম খুচরা পোশাক বিক্রেতা ওয়ালমার্টের কাছে যায়। তাছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের একক বৃহত্তম আমদানিকারক। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশ ওয়ালমার্টের পোশাক সরবরাহকারী উৎস দেশগুলোর গুরুত্বপূর্ণ একটি দেশে পরিণত হয়েছে, যার কারণে ওয়ালমার্টের প্রধান নির্বাহী সম্প্রতি বাংলাদেশের কারখানাগুলো পরিদর্শনে আসেন (BGMEA 2010)।

ওয়ালমার্ট এবং ফ্রান্সভিত্তিক 'কারেফোর' মতো একচেটিয়া ব্যবসায়ীরা সারা পৃথিবী জুড়ে দাম ও মজুরি কমানোর জন্য তাদের প্রভাব ব্যবহার করে। রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে ২০০৬ সালের মে মাসে প্রায় ১,০০০ কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরপরই উভয় কোম্পানিই বাংলাদেশ সরকারকে যথাযথ সময়ে পণ্য ডেলিভারী করার জন্য আহ্বান জানায়। যুক্তরাষ্ট্রের এক পত্রিকা তাদের বিশ্লেষণে জানাচ্ছে, বাংলাদেশে 'নিম্ন মজুরির' পিছনে কেবল স্থানীয় পুঁজিপতিদের মুনাফা বৃদ্ধির উদ্দেশ্য নয় বরং

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বিশ্ব পুঁজিপতি খুচরা বিক্রেতা ওয়ালমার্ট ইত্যাদির সৃষ্ট চাপও অনেকাংশে দায়ী (Workers World 2006)।

বহু বছর ধরে এই অবস্থা চলছে। বৈশ্বিক ও স্থানীয় উভয় পর্যায়েই সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীগুলো গার্মেন্টস শ্রমিকদের দ্বারা সৃষ্ট মূল্য থেকে তাদের মুনাফা বাড়ানোর চেষ্টায় নিয়োজিত। আর কারখানার মালিকদের মুনাফা বৃদ্ধির জন্য শ্রমিকদের কম মজুরি দেয়া ও খরচ কমানো ছাড়া অন্য কোনো পথ থাকে না। ফলে তারা অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র, স্প্রিংকলার এবং কারখানাগুলোতে জরুরি নির্গমন পথ তৈরির জন্য বিনিয়োগ করতে উৎসাহিত হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত না এটি তাদের বিদেশি ক্রেতাদের কাছ থেকে অর্ডার পাওয়া বন্ধ না করছে। অনিবার্যভাবেই এসব বিদেশি বিক্রেতা যখন তাদের দেশের বিপণী বিতানগুলোর পণ্যের দাম কমাচ্ছে, তখন এই দাম কমানোর ঝুঁকিটা পুরোপুরি গিয়ে পড়ছে গ্লোবাল চেইনের সবচেয়ে দুর্বলতম শ্রেণী/অংশ পোশাক শ্রমিকদের উপর (Guardian2010)।

এই খাতের ওপর গবেষণা করে দেখা গেছে যে, বাংলাদেশের বড় কারখানাগুলোর গ্রুপ তাদের "কারখানার নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং পণ্যের উৎপাদন মান" অনেকটা শোকেস হিসেবে দুএকটি প্রতিষ্ঠান বিদেশী বিক্রেতাদের কাছে উপস্থাপন করে। অথচ এই গ্রুপগুলোরই অন্যদিকে কম সুবিধাসম্পন্ন দুর্বল অন্যান্য উৎপাদন ইউনিট থাকে যা তাদের পণ্য উৎপাদনের জন্য প্রধান ভূমিকা পালন করে। Labowitz and Pawly (2014) এর গবেষণায় দেখা যায় যে, এই শিল্পের সাথে জড়িত মানুষরা এই বাস্তবতা স্বীকার করে নেয় যে, যেখানে বড় বড় কারখানা গোষ্ঠীগুলো পশ্চিমা ক্রেতাদের সাথে সরাসরি সম্পর্ক বজায় রাখে অথচ তাদের পিছনে ছোট ও নিম্ন Compliance-এর ফ্যাক্টরীগুলোর একটি বিস্তৃত নেটওয়ার্ক রয়েছে এবং এই নিম্ন নিরাপত্তা মানের কারখানাগুলো এসব বড় কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত। এই সাব-কন্ট্রাকটিং পদ্ধতিকে তুলনামূলকভাবে সহজ মনে হয় কারণ এখানে মূল ব্র্যাণ্ড বা কারখানাগুলো ব্যাংকিং, পরিবহন এবং আমলাতন্ত্রের পরিচালনার মতো কাজগুলো তাদের দায়িত্বে রাখে।

অস্বচ্ছ সাব-কন্ট্রাকটিং সম্পর্কে শক্তিশালী নীতিমালা থাকা সত্ত্বেও বিদেশি ক্রেতারা এর প্রচলিত চর্চার উপর কোনো মনোযোগ দেয়নি। তাদের মূল আকর্ষণ হলো "৯৮% ঠিক সময়ে চালান" এবং বিকল্প উৎস খোঁজা যাতে সময়মত পণ্যের চালান নিশ্চিত করা যায় (Labowitz and Pawly 2014)। উপরন্তু ওয়ালমার্টের মতো প্রভাবশালী ব্র্যাণ্ডগুলো এই শিল্পে সংস্কারের বাধা হিসেবে কাজ করে। এ সব কারখানা শ্রমিকদের বঞ্চনার এক শিকল তৈরি করে, যেখানে বাংলাদেশি পণ্যের সস্তা দাম নিশ্চিত হয় শ্রমিকের জীবনের বিনিময়ে।

৬। সর্বনিম্ন মজুরি, সস্তা পণ্য

শুরু থেকেই অন্যান্য তৈরি পোশাক উৎপাদনকারী দেশের তুলনায় বাংলাদেশের শ্রমিকদের মজুরি অথবা প্রতি এককে শ্রমমূল্য সবচেয়ে কম। শ্রমিকদের আন্দোলনের মুখে কয়েক দফা ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধি সত্ত্বেও এই পরিস্থিতির কোনো গুণগত পরিবর্তন হয়নি। ১৯৯০ এর দশকে বাংলাদেশে প্রতি ইউনিট শ্রমমূল্য ছিল ০.১১ মার্কিন ডলার/প্রতি শার্ট অথচ ভারতে এই মূল্য ছিল ০.২৬ ডলার/প্রতি শার্ট, পাকিস্তানে ০.৪৩ ও শ্রীলঙ্কায় ০.৭৯ (BIDS 2000)।

ব্রাসেলস ভিত্তিক 'আন্তর্জাতিক টেক্সটাইল, গার্মেন্টস এবং লেদার ওয়ার্কার্স ফেডারেশন এর মতে ২০০৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশের একজন পোশাক কর্মী প্রতি ঘন্টায় মজুরি হিসেবে পেয়েছিল ৬ সেন্ট যেখানে ভারত ও পাকিস্তানে প্রতি শ্রমিকের ঘণ্টা প্রতি মজুরি ছিল ২০ সেন্ট, চীনে ৩০ সেন্ট, শ্রীলংকায় ৪০ সেন্ট ও থাইল্যান্ডে ৭৮ সেন্ট (Asian Tribune, May 28, 2005)।

ক্রয়শক্তির ক্ষমতা (পিপিপি) অনুসারেও বাংলাদেশী শ্রমিকদের গড় মাসিক মজুরি সর্বনিম্ন। ২০০৮-০৯ সালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের পিপিপি ডলার অনুযায়ী বার্ষিক নিম্নতম মজুরি হলো: তাইওয়ান ৯৫৫, চীন ২০৪, কম্বোডিয়া ১৫৬, ইন্দোনেশিয়া ১৪২, ভিয়েতনাম ১২০, পাকিস্তান ১১৮, ভারত ১১৩ ও বাংলাদেশ ৬৯ (ILO 2009)।

২০০৬ এবং ২০১০ সালে শ্রমিকদের যৌথ/সংঘবদ্ধ আন্দোলনের মুখে মালিকরা বিদ্যমান মজুরি কাঠামো সংশোধন করতে বাধ্য হয়। বাংলাদেশী মুদ্রা বা টাকায় 'মজুরি কাঠামো'র দিকে লক্ষ করলে দেখা যায়, মজুরির মাত্রা ১৯৯৬ এবং ২০০৬ সালের তুলনায় ৭৮.৮ ভাগ (গ্রেড-১) ও ৯.৮ ভাগ (গ্রেড-৭) বৃদ্ধি পেয়েছে। যদিও ২০০৬ সালের 'মজুরির মাত্রা' ১৯৯৩ সালের মার্কিন ডলারের তুলনায় কমে গিয়েছিল (CPD 2010)। দীর্ঘ প্রতিবাদ এবং আন্দোলনের পর জুলাই ২০১০ সালে ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা করা হয়, যা একজন শ্রমিকের জন্য অপর্যাপ্ত।

২০০৬ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে টাকার সাথে মার্কিন ডলারের বিনিময় হার স্থিতিশীল রয়েছে, তবে দ্রব্যমূল্য বেড়েছে ৫০ শতাংশেরও বেশি এবং এই সময়ের মধ্যে চালের মূল্য বেড়েছে ১০০ ভাগেরও বেশি। এর ফলে 'নতুন মজুরি স্কেল'এর পরও শ্রমিকদের প্রকৃত আয় আসলে কমে গেছে।

২০১৩ সালের ২১ নভেম্বর নতুন মজুরি স্কেল ঘোষণা করা হয়। তখন ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করা হয়েছিল ৫,৩০০ টাকা। অথচ স্বাধীন গবেষণায় তখন একটি পরিবারের দরিদ্র সীমার আয় পাওয়া যায় ১৮,০০০ টাকা। যদিও ২০১০ সালের তুলনায় নতুন স্কেলে নমিনাল ও মার্কিন ডলারের প্রেক্ষিতে মজুরি বেড়েছে, এ আয় এখনও বিশ্বের সর্বনিম্ন মজুরির মধ্যে একটি। তাছাড়া এটি দরিদ্র সীমার আয়ের চেয়েও নিচে এবং চারজন সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিবারের দরিদ্র সীমা 'আয়ের' তিনভাগের এক ভাগ মাত্র। এরপরও অনেক মালিক এই স্কেলের বিরোধিতা করেছেন এবং অনেক কারখানায় এখনও এই ন্যূনতম মজুরি বাস্তবায়িত হয়নি। কাগজেপত্রে বাস্তবায়ন দেখালেও মজুরি বকেয়া রাখা, অনিয়মিত মজুরি প্রদান, গ্রেড প্রতারণায় মজুরি বৃদ্ধি ঠেকানোর অনেক দৃষ্টান্ত আছে। এছাড়া এখনও অনেক অননুমোদিত সাব-কন্ট্রাকটর কারখানা চালু রয়েছে যেখানে এই মজুরি আইন মানার প্রশ্নই ওঠে না।

গত তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে পোশাকের আউট সোর্সিং ব্যবসার সাথে জড়িত একজন ভারতীয় উদ্যোক্তা এক সাক্ষাতকারে বলেন যে, দুর্ঘটনা সত্ত্বেও তৈরি পোশাক শিল্পের ক্রেতারা বাংলাদেশে বড় মাপের ব্যবসা করতে পারবে। কারণ এই দেশে কম খরচে পোশাক তৈরি ও কানাডা, যুক্তরাজ্য ও ইউরোপে শুল্কমুক্ত রপ্তানির সুবিধা বিদ্যমান। বাংলাদেশে ব্যবসা করার "লাভ-ক্ষতি" বিশ্লেষণ করে তিনি বলেন যে, যেখানে বাংলাদেশে প্রতি পিস পকেট জিন্স তৈরিতে খরচ পড়ে প্রায় ১.৩০ থেকে ১.৪০ ডলার, সেখানে ভারতে এক পিস তৈরি করতে প্রায় ৪ থেকে ৫ ডলার খরচ পড়বে (Narayanan 2013)।

এক হিসাবে দেখা গেছে যে, নিউইয়র্ক বা টরেন্টো বা সিডনী বা লন্ডনের সুপার মার্কেটগুলোয় যদি কোনো পোশাক বিক্রি হয় তবে সেই মূল্যের শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ আন্তর্জাতিক ক্রেতা ও খুচরা বিক্রেতাদের পকেটে চলে যায়। পশ্চিমা আমদানিকারক দেশগুলোর সরকারও ভ্যাট বা বিক্রয় শুল্ক হিসেবে এখান থেকে ভালো অর্থ উপার্জন করে। তার ফলে এই আয়ের বড় অংশ তাদের কাছে যায় যাদের এই পণ্য তৈরি করতে কোনো ভূমিকা নেই। বাকি ৪০ ভাগের মধ্যে আমদানি, স্থানীয় উপকরণ ও প্রতিষ্ঠানের খরচ বাবদ প্রায় ৩৫ ভাগ খরচ হয় এবং ১ শতাংশেরও কম বরাদ্দ থাকে শ্রমিকদের জন্য।

শ্রমিকদের মজুরিই শেষ পর্যন্ত কমানো হয়, কারণ তুলার মূল্য বা জাহাজের পণ্য পরিবহন খরচের তুলনায় মালিকরা সহজেই শ্রমিকদের বেতন নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। তাই এটি কোনো আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, বর্তমান মজুরির স্তর "ভালোভাবে বেঁচে থাকার জন্য মজুরি"-এর চেয়ে অনেক কম এমনকি দরিদ্র সীমা আয়ের চেয়েও কম।

কানাডার বাজারে ১৪ মার্কিন ডলারে যখন একটি পোলো শার্ট বিক্রি হয়, তখন বাংলাদেশে এর খরচ নিম্নরূপে বণ্টিত হয় :

- ✓ উপকরণ সামগ্রী, ফিনিশিং : ৩.৬৯ (২৬.৩৫%)
- ✓ শিপিং, ট্যারিফ : ১.০৩ (৭.৩৬%)
- ✓ ফ্যাক্টরী মার্জিন : ০.৫৮ (৪.১৪%)
- ✓ এজেন্ট : ০.১৮ (১.২৮%)
- ✓ প্রতিষ্ঠানের খরচ : ০.০৭ (০.৫%)
- ✓ শ্রমিক মজুরি : ০.১ (০.৮৫%) এবং

বাংলাদেশ থেকে ক্রয়কৃত মূল্য : ৫.৬৭ (৪০.৫%)[1]

উত্তর আমেরিকার খুচরা বিক্রেতারা যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে বাংলাদেশ থেকে পণ্য ক্রয় করতে পছন্দ করে কারণ এতে বিক্রেতারা যেমন অনেক বেশি লাভ করতে পারে তেমনি ভোক্তারাও কম মূল্যে পণ্য কিনতে পারে। কিন্তু কেন? নিচের এই সারণির মধ্যে এর উত্তর নিহিত রয়েছে।

একটি টি-শার্ট উৎপাদনের খরচ (মার্কিন ডলারে)

খরচ	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	বাংলাদেশ
উপকরণ	৫.০০	৩.৩০
ইন্ডাষ্ট্রিয়াল লন্ড্রী	০.৭৫	০.২০
শ্রমিক	৭.৪৭	০.২২
মোট	১৩.২২	৪.৭০

Source: Institute for Global Labour and Human Rights.
http://edition.cnn.com/2013/05/02/world/asia/bangladesh-us-tshirt/index.html

[১]O'Rourke Group (2011) সম্পাদিত সমীক্ষা থেকে।
http://www.prothom-alo.com/detail/date/2013-05-04/news/349443)

এই সারণি থেকে দেখা যায়, একটি টি-শার্ট বানাতে যেখানে বাংলাদেশে খরচ হয় ৪.৭০ মার্কিন ডলার, সেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে খরচ হয় ১৩.২২ মার্কিন ডলার যদিও দুই দেশে উপকরণ খরচের মধ্যে ব্যবধান খুব কম; যুক্তরাষ্ট্রে উপকরণ খরচ ৫ মার্কিন ডলার এবং বাংলাদেশে ৩.৩০ ডলার। মূল পার্থক্য প্রকাশ পায় শ্রম মজুরির ক্ষেত্রে যেখানে একটি টি-শার্টের জন্য বাংলাদেশের শ্রম মজুরি ০.২২ ডলার সেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মজুরি ৭.৪৭ মার্কিন ডলার, যা বাংলাদেশের তুলনায় ৩৩ গুণ বেশি। যেহেতু তৈরি পোশাক শিল্পের বাজার মূলত বৃহৎ ক্রেতা নির্ভরশীল, যেমন বাংলাদেশ প্রান্তে অনেক বিক্রেতা কিন্তু ক্রেতা অল্প সংখ্যক, সেহেতু প্রকৃতপক্ষে ক্রেতারাই পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করে। তৈরি পোশাক শিল্পের ক্রেতা ও ব্র্যাণ্ড মালিকরাই মূল্য নির্ধারক হয়ে উঠে, এবং তারা সবসময় চেষ্টা করে পণ্যের দাম যথাসম্ভব কম রাখতে।

সাম্প্রতিক সময়ে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে ঢাকা ভিত্তিক সর্বনিম্ন দামের একটি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের (যারা দীর্ঘদিন ধরে লম্বা হাতার টপ স্পেনে রপ্তানি করে আসছে) কয়েক দশকের পণ্যের দাম সম্পর্কে বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়। দেখা গেছে, প্রতিবছরই বিদেশী ক্রেতাটি পণ্যের মূল্য আরও কমিয়ে রপ্তানি অর্ডার দেয়; আট বছরে মজুরিসহ উৎপাদন খরচ দ্বিগুণ হলেও প্রতি পিস টপের মূল্য ২০০৫ সালের ৩.৪০ ডলার থেকে কমিয়ে বর্তমানে ২.৪০ ডলারে নামিয়ে আনা হয়। গার্মেন্টস মালিকরা বিক্রেতাদের কাছ থেকে অর্ডার পাওয়ার জন্য এই অস্বাভাবিক কম দামে পোশাক তৈরি করতে সম্মতি জানায়। দাম কমানোর পরও তারা তাদের মুনাফা বজায় রাখার জন্য খরচ কমানোর নতুন নতুন উপায় আবিষ্কার করে। এই সমস্ত বিকল্প উপায়গুলোর মধ্যে একটি হলো সাব-কন্ট্রাকটর দিয়ে কাজ করানো, নিরাপত্তা ব্যবস্থা সংক্রান্ত খরচ কাটছাঁট শ্রমিকদের কর্মঘণ্টা বৃদ্ধি ও অন্যান্য সুবিধা কমিয়ে শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরি নিচে নামিয়ে আনা। মালিকদের তৈরি এসব বিকল্প ব্যবস্থাগুলো শ্রমিকদের বঞ্চনা ও দুর্বলতা বাড়িয়ে দেয়। এটা মনে রাখা প্রয়োজন যে, বিশ্বব্যাপী কিছু নামী ব্র্যাণ্ড বলেছে যে, তারা জানতো না রানা প্লাজায় তাদের পণ্যগুলো তৈরি হতো। এ বক্তব্য আসলে বিশ্ব সরবরাহ চেইনে বিদ্যমান অসঙ্গতি নির্দেশ করে।

৭। ঢাকা থেকে ওয়াশিংটন: সরকার কী দায়িত্ব পালন করছে?

রানা প্লাজা দুর্ঘটনার কয়েক বছর পরও কর্মস্থলে শ্রমিকদের নিরাপত্তা পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেনি। দুর্ঘটনার চার বছর পেরোনোর পরও এখন পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য ক্ষতিপূরণ নীতি প্রণীত হয়নি। রানা প্লাজার ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোরও বহু কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে ক্ষতিপূরণের অর্থ পর্যন্ত পৌঁছাতে। বিজিএমইএ এবং অন্যান্যদের কাছ থেকে চাকরী পাওয়ার প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও অনেক জীবিত শ্রমিক এখনও চাকরি পাননি।

অ্যাকশন এইড বাংলাদেশের এক জরিপে দেখা গেছে যে, জীবিতদের ৬৩.৭৪ শতাংশ এখনও শারীরিক অসুস্থতা, ২৩.৭৬ শতাংশ মানসিক সমস্যা এবং ৭.৫৪ শতাংশ নিয়োগকারীর অনিচ্ছার কারণে কাজে যোগ দিতে পারেনি (AA 2014)। সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) রানা প্লাজা দুর্ঘটনার শিকার ৮৩৪টি শ্রমিকের পরিবারের মধ্যে এক জরিপ পরিচালনা করে। এই জরিপ থেকে জানা যায় যে, দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত অধিকাংশ শ্রমিকই বিবাহিত ছিল এবং ৫৬.৭ শতাংশ শ্রমিকের শিশু

সন্তান ছিল। মৃত অথবা গুরুতর আহত শ্রমিকদের এই বাচ্চারা সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল অথচ তাদের অধিকাংশই কোনোরকম সাহায্য ছাড়াই দিন কাটাচ্ছে (CPD 2014)।

মার্কিন সরকার রানা প্লাজা দুর্ঘটনার এক বছরের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে আমদানিকৃত পোশাকের উপর থেকে অন্তত ৮০০ মিলিয়ন ডলার আমদানি শুল্ক আয় করেছে। অথচ এই দুর্ঘটনার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের ব্র্যাণ্ডগুলোর মধ্যে দায়বদ্ধতা সৃষ্টির জন্য কোনো নীতিই গ্রহণ করা হয়নি। উপরন্তু বাংলাদেশের গার্মেন্টস মালিকদের শাস্তি দেওয়ার নামে জিএসপি (পছন্দনীয় দেশের উপর শুল্কমুক্ত সুবিধা) নীতি স্থগিত করে যেখানে গার্মেন্টসগুলো কখনোই এই সুবিধা ভোগ করতে পারেনি। ২৭ জুন ২০১৩ সালে প্রেসিডেন্ট ওবামা বাংলাদেশের জন্য জিএসপি সুবিধা প্রত্যাহারের ঘোষণা দেন এবং বলেন যে, "আমি মনে করছি বাংলাদেশের উপর এই সুবিধা প্রত্যাহার করা একটি উপযুক্ত সিদ্ধান্ত...কারণ তারা নিজ দেশের শ্রমিকদের রক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক শ্রম আইন অনুযায়ী যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না।" তার এই ঘোষণা শ্রমিকদের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ ও সহমর্মিতার মতো শোনালেও আসলে তা নয়। গার্মেন্টস মালিকদের শাস্তি দেওয়ার নামে "জিএসপি" সুবিধা বাতিল করা হয় অথচ যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানিযোগ্য এই পণ্যটি কখনই এ সুবিধা ভোগ করেনি, বরং যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বৈষম্যমূলক নীতি ও উচ্চ শুল্কের বাধার মধ্যে বাংলাদেশ তৈরি পোশাক শিল্পকে টিকে থাকতে হয়েছে।

অক্সফাম ইউএসএ-এর মতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ট্যারিফ বা গড় আমদানি শুল্ক হার ১.৭ শতাংশ। ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য ও সৌদি আরব এ ক্ষেত্রে ১ শতাংশের কম শুল্ক দেয়। কিন্তু বাংলাদেশের মতো একটি কম উন্নত দেশ (এলডিসি) গড়ে প্রায় ১৬ শতাংশ শুল্ক দিয়ে থাকে। এলডিসিভুক্ত দেশগুলো থেকে আয় করা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বমোট শুল্কের মধ্যে বাংলাদেশ প্রায় ৬০ ভাগ শুল্ক পরিশোধ করে। এমনকি আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) ও স্বীকার করেছে যে, বাংলাদেশের মতো দরিদ্র দেশগুলোই যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে সবচেয়ে বেশি আমদানি শুল্কের মুখোমুখি হয়, যা ধনী দেশগুলোর তুলনায় চার থেকে পাঁচ গুণ বেশি।[২]

মার্কিন রাষ্ট্রদূত টেরি মিলার এবং রায়ান ওলসন এ বিষয়ে সঠিকভাবেই যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। তাঁদের মতে এই পদক্ষেপ (জিএসপি সুবিধা স্থগিত করা) দমনমূলক ও লক্ষ্যচ্যুত। প্রকৃতপক্ষে ২০১২ সালে জিএসপি সুবিধার আওতায় মাত্র ১১৮টি পণ্য ছিল এবং এ সুবিধার আওতায় আমদানিকৃত পণ্যের মূল্যমান ছিল ৩৪.৭ মিলিয়ন ডলার। যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশ থেকে প্রতিবছর ৫ বিলিয়ন ডলারের মতো পণ্য আমদানি করে, তার তুলনায় জিএসপি'র আওতায় আমদানি মূল্য ১ শতাংশেরও কম। সিদ্ধান্তের প্রভাব গার্মেন্টস শিল্পে সামান্যই পড়বে কারণ, এর বেশির ভাগ পণ্যই জিএসপি সুবিধার বাইরে।"

জিএসপি নিয়ে বিভিন্ন কার্যকলাপ বস্তুত বিভ্রান্তিকর। যদি যুক্তরাষ্ট্র বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) নীতি অনুসরণ করে বৈষম্যমূলক ও রক্ষণশীল বাণিজ্য নীতি বন্ধ করে দিতো, তাহলে বাংলাদেশের মতো দেশগুলো এই শিল্পে গুণগত পরিবর্তন আনয়ন অনেক বেশি জোরদার হতো। তা না করে যুক্তরাষ্ট্র তাদের অন্যান্য এজেণ্ডা বাস্তবায়নে এই সুযোগকে কাজে লাগাচ্ছে। উল্লেখ্য যে,

[২] http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2002/09/smith.htm

২০১৩ সালের নভেম্বর মাসে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র সরকারের মধ্যে "জিএসপি সুবিধা সরকারের মধ্যে পুনর্বহালের লক্ষ্যে একটি প্ল্যাটফর্ম খুঁজে পাওয়ার জন্য" টিকফা (বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সহযোগিতা) চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

যদিও গত কয়েকবছরে বাংলাদেশ সরকার এই শিল্পের অবস্থা পরিবর্তনের জন্য অতি সামান্য পদক্ষেপই নিয়েছে, গার্মেন্টস মালিকরা ঠিকই সরকারের কাছ থেকে আরও বেশি সুবিধা আদায়ে সক্ষম হয়েছে। বছরের পর বছর ধরে বিভিন্ন ধরনের রপ্তানি প্রণোদনা বা সুবিধাগুলোর সাথে যোগ হয়েছে আরও নগদ সমর্থন, শুল্ক সুবিধা। এর বেশিরভাগ সুফল পেয়েছে বৃহৎ মালিকেরা। "এ কারণেই বৃহত্তম তৈরি পোশাক কারখানাগুলো সবচেয়ে বেশি সংখ্যক অর্ডার এবং অন্যান্য সুবিধাগুলোর এক নেটওয়ার্ক পায় যেখানে প্রকৃত উৎপাদনের চেয়ে সাব-কন্ট্রাক্ট চালালে মুনাফা বেশি হয়"(Labowitz and Pawly 2014)। যেমন উৎস থেকে কমানোর কারণে ২০১৩-১৪ এ এক বছরেই গার্মেন্টস মালিকদের প্রায় ২ হাজার কোটি টাকা লাভ হয় । অথচ একই সময়ে রানা প্লাজা ধসের পর শ্রমিকদের সাহায্যার্থে রাষ্ট্রীয় তহবিলে বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর দেওয়া ১২০ কোটি টাকা অদ্যাবধি শ্রমিকদের কাছে পৌঁছায়নি বলে অভিযোগ রয়েছে।

৮। অ্যাকর্ড এবং অ্যালায়েন্স : ব্র্যাণ্ডদের ভূমিকা

রানা প্লাজা দুর্ঘটনার পর বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নাগরিকরা কোটি কোটি ডলার মূল্যের এই শিল্পে শ্রমিকদের অবস্থা নিয়ে অসন্তোষ ও ক্রোধ প্রকাশ করে। নাগরিকদের বিক্ষোভের প্রতিক্রিয়ার কারণে আন্তর্জাতিক ব্র্যাণ্ড ও আমদানিকারক দেশসমূহের খুচরা বিক্রেতাদের মধ্যে কিছু উদ্যোগ লক্ষ করা যায়। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো 'অ্যাকর্ড' ও 'অ্যালায়েন্স' গঠন। এই দুটি উদ্যোগই পাঁচ বছরের জন্য পরিকল্পনা করা হয়।

আগুন এবং ভবন সুরক্ষার জন্য অ্যাকর্ড ১০ মে ২০১৩ সালে ইন্ডাস্ট্রিয়াল (হেড অফিস জেনেভা) এবং ইউএনআই গ্লোবাল ইউনিয়ন (হেড অফিস জেনেভা) এর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়।[৩] অ্যাকর্ড হলো শ্রমিক ইউনিয়ন এবং ১৫০টির বেশি পোশাকের ব্র্যাণ্ড এবং খুচরা বিক্রেতাদের কোম্পানিগুলোর চুক্তি। অধিকাংশই ইউরোপীয় হলেও উত্তর আমেরিকার কিছু ব্র্যাণ্ডও চুক্তিতে যোগ দেয়। শর্তযুক্ত হবার কারণে এই শিল্পের সাথে জড়িত বড় বড় কোম্পানি যেমন ওয়ালমার্ট অ্যাকর্ড চুক্তি স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করে। কারণ অ্যাকর্ড কোম্পানিগুলোকে স্বাধীনভাবে কারখানার নিরাপত্তা ব্যবস্থা পরিদর্শন, প্রয়োজনীয় সংস্কারের জন্য তহবিল গঠন এবং প্রতিটি কারখানায় নির্দিষ্ট পরিমাণের অর্ডার বজায় রাখার জন্য বাধ্য করে।

আমেরিকান অ্যাপারেল এণ্ড ফুটওয়্যার এসোসিয়েশন এবং কয়েকজন মার্কিন সিনেটরের উদ্যোগে ২০১৩ সালের জুলাই মাসে দি অ্যালায়েন্স নামে একটি শর্তবিহীন জোট গঠিত হয়। উত্তর আমেরিকার বৃহত্তম ব্র্যাণ্ড ওয়ালমার্ট ও গ্যাপ এই জোটের অংশ। এছাড়া ইউএসএইড, বিশ্বব্যাংকের প্রতিষ্ঠান (আইএফসি)ও এই জোটের সদস্য। অ্যাকর্ডের বিপরীতে অ্যালায়েন্সের নেতৃত্বে রয়েছে এই শিল্পের প্রধান নির্বাহী এবং কোম্পানীর প্রতিনিধিগণ। এর পরিচালনা পর্ষদে রয়েছে ওয়ালমার্ট এর ভিপি, বিজিএমইএ-র প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত, গ্যাপ এর প্রধান, এবং লি এণ্ড ফুং

[৩] অ্যাকর্ড সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন http://www.bangladeshaccord.org/

এর প্রতিনিধি। অ্যাকর্ডের প্রোগ্রামের মূল উপাদানগুলো হলো: "কারখানার নিরাপত্তা পরিদর্শন ও প্রতিকার, ভবন নিরাপত্তার উপর প্রশিক্ষণ এবং কারখানার পরিবেশ উন্নয়নের জন্য সদস্যদের দ্বারা গঠিত তহবিল"। অপরদিকে অ্যালায়েন্সের লক্ষ্য হলো "কারখানার নিরাপত্তা পরিদর্শন, নিরাপত্তা ও ক্ষমতায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং কারখানার পরিবেশ উন্নয়নের জন্য স্বেচ্ছায় ঋণ।"

অ্যাকর্ড হলো বিভিন্ন কোম্পানি ও ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে আইনত বাধ্য একটি চুক্তি কিন্তু অ্যালায়েন্স আইনগতভাবে বাধ্য কোনো প্রোগ্রাম নয় এবং এতে ট্রেড ইউনিয়ন, শ্রমিক ও শ্রমিক প্রতিনিধিদের কোনো ভূমিকা নেই। যদিও অ্যাকর্ড এবং অ্যালায়েন্সের কাজ বাংলাদেশে প্রায় একই রকম, যেমন কিছু নির্বাচিত কারখানায় স্বল্প মেয়াদি পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা তৈরি করা, আগুন ও ভবনের নিরাপত্তা এবং ব্যবস্থাপনা বিষয়ে শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং সেই সাথে তাদের প্রাথমিক সরবরাহকারী কারখানাগুলোতে সীমিত পরিমাণে সম্পদ সরবরাহ করা। এটা লক্ষণীয় যে, এইসব সুবিধা সরবরাহকারী কোম্পানি ইতিমধ্যেই বাংলাদেশে "সেলস শো" করা শুরু করেছে।

এই দুটি উদ্যোগের মধ্যে প্রায় ১,৮৭৩টি কারখানার পরিদর্শনের সুযোগ রয়েছে, কিন্তু বাংলাদেশে নিবন্ধিত ও অনিবন্ধিত প্রায় ৫-৬ হাজার কারখানা আছে। অতএব এটি অনিশ্চিত যে, অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্স এর পরিদর্শন ও প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা সেসব কারখানাতে পৌঁছাবে যেসব কারখানায় শ্রমিকরা আসলেই সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে রয়েছে (Labowitz and Pawly 2014)।

এই উদ্যোগগুলোর মধ্যে কিন্তু ক্ষতিপূরণ প্রদানের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত নয়। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) ক্ষতিপূরণের জন্য তহবিল গঠনের উদ্যোগ নেয়। স্পেকট্রাম গার্মেন্টসে দুর্ঘটনার শিকার শ্রমিকদের দেওয়া ক্ষতিপূরণকে ভিত্তি বা বেঞ্চমার্ক হিসেবে ধরে রানা প্লাজায় দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য আনুমানিক ৭৪.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের ক্ষতিপূরণ তহবিল লাগবে বলে অনুমান করা হয়। আইএলও কনভেনশন ১২১ এবং বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী রানা প্লাজায় ক্ষতিগ্রস্ত ৩,৬০০ জনকে ক্ষতিপূরণ দেয়ার জন্য একটি একক পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আইএলও এর লক্ষ্য হলো ৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সংগ্রহ করা যার মধ্যে বর্তমানে ১৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার রয়েছে।[৪] হিউম্যান রাইটস ওয়াচের মতে, ১৫টি আন্তর্জাতিক খুচরা বিক্রেতা যাদের আনুষ্ঠানিকভাবে এই ধসের ঘটনায় অর্থ দেওয়ার কথা তারা এখনও ফাণ্ডে কোনো টাকা দেয়নি। এদের মধ্যে ১৪টি ব্র্যাণ্ডের কাছে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ তহবিলে/ফাণ্ডে এখনও পর্যন্ত কোনো অবদান না রাখার কারণ জানতে চায়[৫]? এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, ব্র্যাণ্ডগুলি থেকে তহবিল সংগ্রহ স্বেচ্ছামূলক, তহবিলের জন্য ব্র্যাণ্ডগুলোকে বাধ্য করার কোনো আইনি ব্যবস্থা প্রণয়ন করা হয়নি।

এই জোটগুলো যেসব বিষয় তুলছে সেগুলো আরও অনেক কার্যকরভাবে বাস্তবায়নে সরকার ও বিজিএমইএ-র উদ্যোগই যথার্থ ছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রানা প্লাজা ধসের পর এই শিল্পখাতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনতে বাংলাদেশে সরকার ও বিজিএমইএ-র বিস্ময়কর নিষ্ক্রিয়তার কারণেই এসব আন্তর্জাতিক জোটের প্রাসঙ্গিকতা তৈরি হয়েছে।

---

[৪] অ্যালায়েন্স সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন http://www.bangladeshworkersafety.org/

[৫] ফাণ্ডের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে নেয়া হয়েছে। http://www.ranaplaza-arrangement.org/fund/donors, retrieved on May 6, 2014.

৯। উপসংহার

বেশিরভাগ কোম্পানিই উপরে বর্ণিত এইসব দুর্ঘটনাকে সংক্ষেপে জনসংযোগ সমস্যা বা "পি আর দুর্যোগ" হিসেবে দেখে থাকে, কিন্তু এই দুর্ঘটনাগুলো হাজার হাজার শ্রমিক পরিবারের মধ্যে স্থায়ী আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। সবদিক বিবেচনায় আন্তর্জাতিক ও বহুজাতিক কোম্পানিগুলো তাদের যথাযথ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে, যদিও তাদের মুনাফা বেড়েছে আগের চেয়ে বহুগুণ।

তাই বিশ্বব্যাপী সরবরাহ শৃঙ্খল বা গ্লোবাল চেইন অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমরা দেখতে পাই বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের দ্বারা প্রস্তুতকৃত পণ্যের দাম থেকে মুনাফা লুটে ধনী থেকে ধনীতর হচ্ছে বাংলাদেশ ও পশ্চিমা বিশ্বের কিছু সংখ্যক গোষ্ঠী বা গ্রুপ। অথচ কারখানাগুলোতে ন্যূনতম কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার দায়িত্ব থেকে তারা নিজেদের বরাবর দূরে রেখেছে।

এক কথায়, রানা প্লাজা ও তাজরীন গার্মেন্টসের ভয়াবহ এই অভিজ্ঞতা সৃষ্টি হয়েছে দেশ-বিদেশের বণিক গোষ্ঠীর অতি মুনাফা প্রবণতা এই শিল্প ও এতে নিয়োজিত শ্রমিকদের প্রতি দায়বদ্ধতার অভাব থেকে। বিশ্বব্যাপী বিদ্যমান অবিচার ব্যবস্থার কারণে কারখানার মালিক, বিজিএমইএ, এজেন্ট ও বিশ্বব্যাপী খুচরা বিক্রেতারা তাদের দায়িত্ব থেকে রেহাই পেয়ে যায়। এর ফলে সাভার থেকে নিউইয়র্ক পর্যন্ত জবাবদিহিতার একটি ব্যর্থ বিশ্বব্যবস্থা উন্মোচিত হয়। তাই সাভার থেকে নিউইয়র্ক পর্যন্ত এই অসঙ্গতিপূর্ণ ব্যবস্থার পর্যবেক্ষণ ও বঞ্চিত শ্রমিকদের অধিকার রক্ষার জন্য সমবেত কণ্ঠে প্রশ্ন তোলার দায়িত্ব আমাদের সকলেরই।

গ্রন্থপঞ্জি

Action Aid (2014): *Survey on Rana Plaza Survivors*, quoted from Daily Star, 21 April.

Paul-Majumdar, Pratima and Binayak Sen (2000): *Growth of Garment Industry in Bangladesh: Economic and Social Dimensions*, January.

FIDH (Worldwide Human Rights Movement) (2014): "One year after the Rana Plaza Catastrophe: *Slow Progress and Insufficient Compensations*," 21 April.

Sarah, Labowitz and Dorothée Baumann-Pauly (2014): *Business as Usual is Not an Option Supply Chains and Sourcing after Rana Plaza*, April, Center for Business and Human Rights at New York University Stern School of Business.

Cheng, Leonard K. *and* Henryk Kierzkowski, eds. (2001): *Li & Fung, Ltd.: An Agent of Global Production in Global Production and Trade in East Asia*, Springer. pp. 317–323.

CPD (Centre for Policy Dialogue) (2010): *State of the Bangladesh Economy in FY 2008-09 and Outlook for FY2009-10*, February.

____(2014): "One Year after the Rana Plaza Tragedy: Where do We Stand?" Third monitoring Report. 23 April, Dhaka.

Guardian (2010): http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2010/dec/19/ cheap-clothes-bangladesh-lucy-siegle?INTCMP=ILCNETTXT3487

ILO (International Labour Organization) (2009): *Global Wage Report 2008-09.*

Muhammad, Anu (2002): "Closure of Adamjee Jute Mills: Victory of Anti-industrial Development Project?" *Economic and Political Weekly,* Mumbai, September 21-27.

Muhammad, Anu (2006): "From Mills to Malls: Globalization and Peripheral Capitalism: Bangladesh Experience," *Economic and Political Weekly,* 15-21 April. Mumbai.

____(2007): *Development or Destruction, Essays on Global Hegemony, Corporate Grabbing and Bangladesh,* Sraban.

____(2011): "Wealth and Deprivation: Readymade Garments in Bangladesh," *Economic and Political Weekly* (EPW), August 20.

____(2015): "Workers' Lives, Walmart's Pocket," *Economic & Political Weekly* (EPW), June 20.

Narayanan, R. Yegya (2013): " Bangladesh is still attractive for garment outsourcing," *The Hindu Business Line*, 3 June.

TIB (Transparency International Bangladesh) (2014): *Governance in RMG: Commitment and Progress," A follow up Report*, 21 April, Dhaka (in Bangla).

Michael, P. Todaro and Stephen C Smith (2006): *Economic Development*, Indian edition.

Workers World (2006): "Garment Strikes in Bangladesh Whose Responsibility, Whose Interests?" USA, June.

UN (2008): *Trade and Development Report,* United Nations.